সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

যাঁরা সত্যিকারের প্রেমিক তাঁদের জন্য এক আনন্দলোকও অর্থহীন। তাঁরা চায় আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হতে – সেটাই তাঁদের জান্নাত।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, মে ২০১৬, শাবান ১৪৩৭

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহ.) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন 'সংলাপ সমগ্র' গ্রন্থ থেকে সংকলিত **

অথচ দুয়ার দুটিই খোলা

আমীন : হুজুর, আপনি সেদিন বলেছেন আল্লাহর পবিত্র বাণীর দুটি রূপ। কথাটা আপনি বুঝিয়ে বলেছেন ঠিকই কিন্তু এর সঠিক অর্থ আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কুরআন– আল্লাহর বাণী এটা বুঝি। কিন্তু মুহম্মদ (সা.) কেমন করে তাঁর বাণীর রূপ হন?

গুরু : আমার তো বোঝাবার ক্ষমতা নেই। কুরআন কেউ কাউকে বুঝাতে পারে না। কুরআনের শিক্ষক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ– আ'ল্লামাল কুরআন [সুরা আর-রাহমান, আয়াত নং-২]। কাজেই স্রষ্টার কাছেই বলবো তিনি যেন তোমাকে বোঝার ক্ষমতা দেন। আল্লাহর বাণীর বিমূর্ত রূপ হচ্ছে আল কুরআন। বইতে কালো কালো অক্ষরে যা লেখা থাকে সেটা কি কুরআন? কুরআন ঐ অক্ষরের শৃঙ্খলে আবদ্ধ একটা রূপহীন মহাসত্যের বিমূর্ত প্রতীক। কুরআনকে যারা অক্ষরের মাঝে খোঁজ করে তারা ভুল করে। ঐ অক্ষরের মাঝে যারা অর্থের খোঁজ করে তারা আরো বেশি ভুল করে। কারণ কুরআনের বিন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই লজিক্যাল বা ন্যায়শাস্ত্রসম্মত পারম্পর্য নেই। অনেকটা তোমাদের অত্যাধুনিক কবিতার মতো যেখানে অর্থ কিংবা ন্যায়শাস্ত্রসম্মত পারম্পর্যের চাইতে অনুভূতির অনুষঙ্গই বড়। বলতে পারো কুরআন প্রসঙ্গে কবিতার কথা বলছি কেন। কুরআন তো একটা মহৎ কবিতা। আর এ কবিতা বুঝতে গেলে কবির অন্তর থাকতে হয়। তোমাদের মতো সমালোচকরা কবিতার অর্থের ব্যবচ্ছেদ করে কিন্তু তাদের অনেকেই অনুভূতির উত্তাপে কবিতার মর্ম অনুধাবন করে না। সে জন্যই কুরআনের কোনো অনুবাদ হয় না– ঠিক যেমন কবিতার কোনো অনুবাদ হয় না। প্রত্যেক বাণীর পেছনে কিন্তু একটা রূপ আছে। ভাবলোকের রূপ ছাড়া কোনো বাণী হয় না। আপাতদৃষ্টিতে বাণী বিমূর্ত- অরূপ। কিন্তু বাণীর পেছনে রূপ কিন্তু ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে। ওটাকেই সত্য বলে জেনো। কারণ দৃষ্টির আড়ালে থাকা ঐ রূপটি না থাকলে যাকে কবিতা রূপে দেখছো সে হতো অর্থহীন। আল্লাহ তো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন ঐ কবিতার মতোই। তিনি নিজে কবি। তাঁর চেয়ে মহৎ শিল্পী আর কোথায় আছে বলো। কিন্তু সৃষ্টির আগে একটি অপার শূন্যতায় মগ্ন বিধাতা কী দেখে তাঁর কবিতা রচনা করলেন। যাঁকে তিনি ভাবলোকের শূন্যতায় প্রত্যক্ষ করলেন– তিনিই মুহম্মদ (সা.)। সেই রূপে মুগ্ধ শিল্পী বললেন– কুন, হয়ে যাও। তাই শূন্যতা প্রকাশ পেলো রূপে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আদিতে উপলব্ধ সেই মহাসত্যেরই বাস্তব রূপ। মুহম্মদই (সা.) সেই মহাসত্য– সেই নূর যাঁর আলোতে সমগ্র সৃষ্টি আলোকিত। তোমরা কুরআন পড়ো, কুরআনকে দেখতে চাও না– ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করো মাত্র। কুরআনকে দেখতে চাইলে দেখো মহানবীর সমগ্র জীবনের দিকে। সেই হচ্ছে কুরআনরূপী কবিতার পেছনে মূর্ত রূপ।

আল্লাহ তাই কুরআনের সুরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে বলেছেন– 'লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানা' লি মান কানা ইয়ারজুল্লাহা ওয়াল ইয়াওমাল আখিরা ওয়া জাকারাল্লাহা কাসিরা– অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করে এবং আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

আমিন : অর্থাৎ রাসুলই (সা.) হচ্ছেন কুরআনরূপী কবিতার মূর্ত রূপ?

গুরু : ঠিক তাই। আর এই রূপের মধ্যে যে নিজের সমস্ত আনুগত্য, সমস্ত প্রেম দিয়ে বিলীন না হবে তার জিকির, তার আল্লাহর নৈকট্য কামনা, তার পরকালের উপলব্ধি সবই বৃথা। উসাওয়াতুন হাসানা হচ্ছে পবিত্র জীবন– আর এমন জীবনের তিনটি দিকেই রয়েছে অনুকরণীয় আদর্শ। সে তিনটে দিক হচ্ছে তাঁর কথা, তাঁর কাজ এবং অন্যের কাজে তাঁর নীরব অনুমোদন। আর এ আদর্শ হচ্ছে তাদের জন্য যারা আল্লাহর জিকির করে, তাঁর সান্নিধ্য কামনা করে এবং পরকালের বাস্তবতাকে স্মরণে রাখে। জিকির হচ্ছে সেই আলো যা জ্বলে উঠলে সত্যকে অবলোকন করা যায়। স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ হচ্ছে তার দর্শন– তার মারেফত। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। দেখতে হলে আলো চাই। চর্মচক্ষু সত্ত্বেও মানুষ অন্ধ। তাই অন্তরের আলো জ্বালতে হলে জিকির করতে হবে। জিকিরই আলো হয়ে তোমাকে তোমার স্রষ্টার মুখোমুখি করে দেবে। সেই আলোকে যাকে দেখবে তাকে হয়তো অচেনা মনে হবে না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হয়তো ভাববে এ তো আমার চিরচেনা।

আমিন : চিরচেনা মনে হবে, ব্যাপারটি ঠিক...।

গুরু : বুঝতে পারছো না, তাই না। যে তোমার অন্তরে বসে আছে তাঁকে চিনতে তোমার সময় লাগবে কেন। তোমার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখে সেই তোমার পায়ে পায়ে চলছে। তাঁকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম মহিমায় দেখতে চাও তো তাকিয়ে দেখো সেই 'উসওয়াতুন হাসানার' দিকে। কবিতার অন্তরে যে রূপ তাকে যেমন উপলব্ধি ছাড়া প্রত্যক্ষ করা যায় না– তেমনি কুরআনের অন্তরের যে রূপ– সেই উসওয়াতুন হাসানাকেও প্রেমানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। আল্লাহর পবিত্র বাণীর সম্যক উপলব্ধি হবে তখনই যখন মূর্ত এবং বিমূর্ত উভয় কুরআনকেই তুমি দেখতে পাবে। সেটাই হবে তোমার মারেফত, তোমার সত্যদর্শন। মানুষ কিন্তু চর্মচক্ষু দিয়ে কোনো সত্যকেই দেখে না। জন্ম একটা সত্য– এটার প্রকৃত রূপ সে উপলব্ধি করে না। মৃত্যু আর একটা সত্য, এটাকেও সে উপলব্ধি করে না। এ দুটি দুয়ারকেই সে বন্ধ দেখে। অথচ দুয়ার দুটিই খোলা– সে কথা সে পরম নির্ভাবনায় ভুলে থাকে। ■

মানব জীবনে ধর্ম পালনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ডা. মো. হাবিবুর রহমান

ধর্ম শব্দের উৎপত্তি ধৃ ধাতু থেকে, যার সোজা অর্থ ধারণ করা। সাধারণ মানুষ ধর্মের শিক্ষাকে ধারণ করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তবে বিষয়টি জটিল। 'ধর্ম হলো এক অদৃশ্য শক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলনের ইচ্ছা, যে শক্তি আমাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।' ধর্ম এক অদৃশ্য আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে মানুষের ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপনের চেতনা। আমরা মানুষেরা অসম্পূর্ণ তাই পূর্ণতার অনুসন্ধান করাই ধর্ম। সমাজের বিবর্তনে আদিম অবস্থা থেকে এ পর্যন্ত ধর্মের শিক্ষা নৈতিকতার সঙ্গে মিশে আছে। ধর্মের দুটি দিক আছে। বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গ দিক। প্রথমটি আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, অনুভূতি। ধর্মের প্রধান অঙ্গ হলো আল্লাহর ওপর একান্ত নির্ভরতাবোধ। আমাদের সব কর্তব্যবোধকে আল্লাহর আদেশরূপে মেনে নেওয়া । পৃথিবীর সব ধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অদৃশ্য শক্তির ওপর বিশ্বাস এবং তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠা। পৃথিবীর প্রতিটি জীব ও বস্তুর ধর্ম আছে। একটি বিশেষ গতিপথ ও কর্মপ্রণালীর নাম ধর্ম। বৃক্ষ ফল প্রদান করে, ভূমি শস্য উৎপাদন করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে, সূর্য আলো বিকিরণ করে– এ সবই তাদের আপন আপন ধর্ম। বিশ্বের সেরা জীব মানুষ ন্যায়ের সঙ্গে, নিরপেক্ষ বিবেক দিয়ে প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্ন করবে এটাই সকলের কাম্য। যা অন্যের উপকারে আসে তাই মানুষের ধর্ম। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– ইসলাম ফিতরতের ধর্ম বা স্বভাবের ধর্ম। অর্থাৎ ধর্মকে বাদ দিয়ে মানবজীবন মূল্যহীন। মানুষ চব্বিশ ঘণ্টাই যে যে কাজ করবেন তার সবই ধর্মীয় কাজ অর্থাৎ কাজই ধর্ম, ধর্মই কাজ।

একজন সচেতন ও শিক্ষিত মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বস্থানে বিরাজমান ও সর্ব শক্তিশালী। এসব জেনেও বহু বিশ্বাসী ব্যক্তি রাতদিন কালোবাজারি করছেন, মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছেন, দেশকে ফাঁকি দিচ্ছেন, সামান্য কারণে পরের মাথা ভাঙছেন, টাকা দিয়ে দুর্বৃত্তকে হাত করছেন, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করছেন, অসৎ উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি করছেন, গরু-ছাগল দিয়ে অন্যের ফসল খাওয়াচ্ছেন, কর ফাঁকি দিচ্ছেন, ঋণ নিয়ে পরিশোধ করছেন না, জনগণের চাকর হয়ে তাদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করছেন এবং আরও কত প্রকারের অশুভ কাজে লিপ্ত থেকে একই সঙ্গে নামাজ, রোজা ও হজ করেই চলেছেন।

আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে মানবজীবন গঠিত। আত্মার উন্নতির দিকে উদাসীন হয়ে দৈহিক চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকা চরম অন্যায়। দেহের মতো আত্মার সুস্থতা-অসুস্থতা, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, সবলতা ও দুর্বলতা রয়েছে। দৈহিক পবিত্রতা আত্মিক পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল। যার আত্মা পবিত্র ও নির্মল সে-ই প্রকৃত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– যে আত্মশক্তি লাভ করেছে, সে সফলকাম হয়েছে। যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করবে এবং তার দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে দেহকে বাঁচিয়ে রাখবে সে ব্যক্তি অপবিত্র ও কলুষিত। এরূপ কলুষিত দেহে যে আত্মার বাস সে আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত। ধর্ম আপনাকে জীবন সম্পর্কে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে বলে। ধর্ম আপনাকে সুখ এবং দুঃখ দুটি অবস্থায়ই হাসিমুখে মেনে নেওয়ার শক্তি জোগায়। কীভাবে এ শক্তি জোগায় সে? প্রথমত, এ জগতে আপনার স্থান কোথায়, আপনার সাথে জগতের সম্পর্কটা কী, সে সম্পর্কে ধর্ম আপনাকে সচেতন করে তোলে। ধর্ম আপনার ভেতর এই দৃঢ় প্রত্যয় সঞ্চারিত করে যে, আপনি মহত্তম, এই সংসারকে যত প্রতিকূলই মনে হোক না কেন আপনার পক্ষে তা অজেয় নয়। আসল কথা হলো, আপনার সুবিধা মতো চারপাশের পরিবেশকে আপনি পাল্টাতে পারেন। পরিবর্তন আনার যে কৌশল– হয়তো আপনার এখন জানা নেই। কিন্তু সময় দিলে এবং চেষ্টা করলে এ ক্ষমতা আপনি অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু এও সব নয়, আত্মজ্ঞান হওয়াটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখন আপনি নিজেকে জানেন না, আপনার মধ্যে কী ক্ষমতা আছে, তাও আপনার অজানা। ধর্ম আপনাকে সে সব অজানা সত্য জানিয়ে দেয়। ধর্ম আপনাকে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করে। এ গৌরব নিছক বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, এ এমন এক প্রত্যক্ষ অনুভূতি যা অকাট্য সত্য। ধর্ম হলো উপলব্ধি– আত্মজয়ের মাধ্যমে জগৎ জয়ের অপরোক্ষ অনুভূতি। ধর্মের বহিরঙ্গ বা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করাই যথার্থ ধর্মবোধের পরিচায়ক নয়। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের এ কথাই বুঝতে ও বোঝাতে হবে। ধর্মের প্রকৃত অর্থকে বুঝতে না পারার কারণে ধর্ম নিয়ে বিরোধ বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মকে শোষণ ও উৎপীড়নের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। বলা হয়, ধর্ম সব দুঃখের মহৌষধ। কিন্তু কেমন করে এবং কী অর্থে? এই অর্থে যে, ধর্ম মানুষের জীবন ও আচার-আচরণের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। শুধু ব্যক্তিকে নয়, ধর্ম গোটা সমাজকেও বদলে দিতে পারে। ধর্ম চায়– সামাজিক বৈষম্য দূর হোক, সবার প্রতি সমান আচরণ করা হোক। জাতি, ধর্ম বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, সম্প্রদায়ে সম্পদায়ে বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোনোরকম বৈষম্য ধর্মের রুচিবিরুদ্ধ। সবাই যে এক তা নয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই পার্থক্য সত্ত্বেও সকলের মধ্যে যে এক মূলগত ঐক্য আছে– ধর্ম সেটাই শেখায়। ন্যায়বিচার, শান্তি ও প্রগতির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। বাস্তবিক জীবনের এমন কোনো দিক নেই যাকে ধর্ম তার গণ্ডির বাইরে রাখতে পারে।

একটি সমাজে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠান ও বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন, নিজ ধর্মের ও অন্য ধর্মের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করলেই বুঝা যাবে যে ধর্মের সংহতি-শক্তি আছে। ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংহতি রক্ষা করবে। প্রকৃত ধর্মবোধ জাগ্রত হলে মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি দূর হতে বাধ্য। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে। ধর্মান্ধতা মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ধর্মের মূলভাবকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ ও অংশ। ধর্মই বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলতে পারে। সংক্ষেপে এ কথাগুলোই হলো ধর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য। যিনি যত তাড়াতাড়ি এ কথাগুলোর মর্মার্থ বুঝবেন তিনি তত তাড়াতাড়ি ধর্মের প্রতিটি হুকুম-আহকাম পালনের প্রতি আগ্রহী হবেন।

মোরাকাবাই খোদাপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ এবাদত

আলহাজ হাকীম সৈয়দ সালেহ আহমদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের যখন শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, হে বান্দা আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমার প্রার্থনা কবুল করবো। আমার কাছে তোমার কী চাওয়ার আছে, চাও, আমি তা দান করবো। আমার কাছে তোমার জীবনের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমার গুনাহ মাফ করে দেবো।' (বুখারি : ৬৯৮৬)।

মোরাকাবার জন্য যে পদ্ধতি, উপাদান ও শিক্ষা প্রয়োজন তা যথাযথ না হলে ফল আশা করা যায় না। তাই মোরাকাবা কেবল একজন তরিকতপন্থী সাধকের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা তিনি উত্তম পথের সন্ধান পেয়েছেন। মোরাকাবা বা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার জন্য অলি-আল্লাহর পরামর্শ, নির্দেশনা ও ফায়েজ হাসিল অবশ্য কর্তব্য। মোরাকাবা হলো নফল এবাদত। নফল এবাদত হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম পন্থা। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, 'যখন আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি, এমতাবস্থায় আমি তার কর্ণ হই, যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে; আমি তার চক্ষু হই, যদ্দ্বারা সে দর্শন করে; আমি তার হাত হই, যদ্দ্বারা সে ধারণ করে; আমি তার পদযুগল হই, যদ্দ্বারা সে হেঁটে বেড়ায়। এমন অবস্থায় সে আমার কাছে যা কিছু চায় আমি সঙ্গে সঙ্গে তা দান করি' (বুখারি : ৬০৫৮)। তাই মোরাকাবা সাধকের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, 'এক ঘণ্টা সময় মোরাকাবা করলে হাজার বছর এবাদত করার চেয়ে উত্তম।' নবীজী অন্যত্র বলেছেন, 'এক বছর সময় মোরাকাবা করলে সত্তর বছরের এবাদতের চেয়ে উত্তম।' অন্যত্র বলেছেন, 'একঘণ্টা আল্লাহর ধ্যান বা মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকা এক বছর যাবৎ এবাদত করার চেয়েও শ্রেয়' (সিররুল আসরার, পৃষ্ঠা ৬২)। মোরাকাবা অন্তরের কালিমাকে পরিষ্কার করে দেয়। যার হৃদয়ের কালিমা বিদূরিত হয়েছে, সে নামাজে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে। হৃদয়ের পর্দায় নুরের আল্লাহর চেহারা মোবারকের সাক্ষাৎ লাভ করে মুমিন বান্দা তৃপ্ত হয়ে থাকে। একমাত্র মোরাকাবার মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হতে পারেন। এ অবস্থায় ওই বান্দার অভিভাবকে পরিণত হন আল্লাহ পাক। এ পর্যায়ে ওই বান্দার সাথেই আল্লাহ পাক সর্বদা অবস্থান করেন। এবং তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে সাহায্য করেন, উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহকে এমন ভাবে আপন করে পাওয়ার জন্য মোরাকাবার দ্বিতীয় আর কোনো এবাদত নেই। তাই প্রতি ওয়াক্ত নামাজ ও এবাদতের শেষে কিছু সময়ের জন্য হলেও নিয়মিত এই এবাদত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা উচিত। তাহলেই একজন সাধক ধীরে ধীরে আল্লাহর খুব কাছাকাছি পৌঁছে যেতে সক্ষম হবেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করিম (সা.) তাঁর রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেন- আল্লাহ বলেছেন, 'বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে এক বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে এক বাহু পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। আর বান্দা যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'

মোরাকাবা করার প্রথম শর্ত হলো দুচোখ বন্ধ করে নেওয়া। অতঃপর তরিকতের ওয়াজিফা মোতাবেক ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া। জাহেরি দুচোখ বন্ধ করে নামাজের মতো বসে খেয়াল কলবে ডুবিয়ে মোরাকাবা করতে হয়। অবশ্য দাঁড়িয়ে বা শুয়েও মোরাকাবা করা যায়। মোরাকাবায় বসে প্রথমে খেয়ালে আপন মোর্শেদের নুরানি কদম মোবারক জড়িয়ে ধরে নিজের ভুল বেয়াদবির জন্য মাপ চাইতে হবে। কাকুতি মিনতি করে নিজের দোষগুলো ক্ষমালাভের চেষ্টা করতে হবে। এমন অবস্থায় মোর্শেদের দিলের সঙ্গে দিল মেশানোর চেষ্টা করতে হবে। এভাবে যখন দিলের মধ্যে শান্তি লাগবে কিংবা অন্তরের চোখে নুর দেখা যাবে এবং ফায়েজ ওয়ারেদ হবে, তখন ধ্যানে ধ্যানে খেয়ালে খেয়ালে চলে যেতে হবে সোনার মদিনায়। নবীজী (সা.)-এর নুরানি-জামালি কদম মোবারক জড়িয়ে ধরতে হবে। নবীজীর কাছে নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। কাকুতি মিনতি করে বলতে হবে ওগো দয়াল দরদী নবীজী, গুনাহ করতে করতে আমি নফসের ওপর অনেক জুলুম করে ফেলেছি। আপনার দয়ার নজরে এই অধম গুনাহগার উম্মতের দিকে একবার তাকান। আমার জীবনের ভুল বেয়াদবি দয়া করে ক্ষমা করে দিয়ে আপনার খালেস উম্মত হিসেবে কবুল করে নিন। এই বলে নবী পাকের দিলের সঙ্গে নিজের নাপাক দিল মেশান এবং খেয়াল করুন নবীজীর দিল মোবারক থেকে ফায়েজ পড়ে আপন দিল ভরাট হচ্ছে, আলোকিত হচ্ছে। এরপর নবীজীর দুখানা জুতা মোবারক ভিক্ষা নিয়ে একখানা দিলের গলায় মালা পরিয়ে আর অপরখানা দিলের মাথায় টুপি পরিয়ে ভিক্ষুকের বেশে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হোন। আল্লাহ পাকের নুরের কদম মোবারক জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলুন, ওগো দয়াল মাওলা দয়াল খোদা, জীবনভর নফসের খায়েশে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পাপ করতে করতে আমার কলবকে কালিমায় ঢেকে ফেলেছি। আপনাকে শত ডাকলেও আপনি এই অধম নালায়েকের ডাকে সাড়া দেন না। ওগো দয়াল মাওলা দয়াল খোদা, আমার গুনাহর দিকে না তাকিয়ে, আপনার রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাকে ক্ষমা করে আপনার খাস বান্দা হিসেবে কবুল করে নিন। এভাবে আল্লাহর সমীপে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর জাতি সিফাতি নাম ধরে ডাকুন। অতঃপর খেয়াল করুন, আল্লাহ পাকের নুরের হৃদয় হয়ে, রাসুল পাক (সা.)-এর সিনাহ মোবারক হয়ে, আপন মোর্শেদের কলব থেকে ফায়েজ পড়ে দিল পাক-সাফ হচ্ছে। দিলের ভেতরের সত্তর হাজার পর্দার ভেতর যত গুনাহের ময়লা রয়েছে তাতে আল্লাহ পাকের ফায়েজ পড়ে সিজ্জিন জাহান্নামে পতিত হচ্ছে। ফলে দিল আলোকিত হচ্ছে এবং দিলের মধ্য থেকে ইসমে জাত আল্লাহ নামের মধুর জিকিরের শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং দিলের চোখে আল্লাহর দিদার বা দর্শন অবলোকন করা যাচ্ছে। মোরাকাবা করলে কলবের চোখ খুলে যায়। এবাদতে জাহেরি চোখ বন্ধ করলেই কেবল বাতেনি চোখ খোলে। আর বাতেনি চোখ দ্বারাই মোমেন বান্দা মেরাজ বা আল্লাহর নুর দর্শন করে। কেননা, কলবের চোখ ব্যতীত আল্লাহর দর্শন ও আল্লাহর দিদার লাভ করা যায় না। মোরাকাবার আসল অর্জনই হলো ফায়েজ। আর এই ফায়েজ দ্বারা দিলের ময়লা দূর হয়। ফলে দিল আলোকিত হয়। আর আলোকিত দিলে আল্লাহর দর্শন লাভ হয়। এবং এবাদত কবুলের সংবাদ তথা কান্তিময় ফায়েজের শীতলতা দেহ ও আত্মা জুড়ে অনুভূত হয়। একজন সাধক চলাফেরা, কথাবার্তা, ওঠাবসা, জাগ্রত-ঘুমন্ত, এককথায় সর্বদা কলবের মাঝে খেয়াল করে চলেন। রাসুল (সা.) দুটি শিক্ষা দিতেন। একটি জাহের অন্যটি বাতেন অর্থাৎ শরিরত ও মারেফত। শরিয়ত হলো ইসলামের সমূহ আচার-আচরণ বা কর্মসূচি। আর মারেফত হলো সেই আচার-আচরণের বাস্তবায়নের ফল অর্থাৎ আত্মিক উপলব্ধি। ইয়াজিদের শাসনামলে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে কেবল শরিয়ত। আর মারেফতের শিক্ষা জিন্দা রয়েছে সুফি-আউলিয়ায়ে কেরামদের অন্তর থেকে অন্তরে। বর্তমান জামানায় একদল নিয়েছে শরিয়ত আবার অন্য দল নিয়েছে মারেফত। তবে যাদের মাঝে আছে দুয়ের সম্ভার তারই হলেন রাসুলের উত্তরাধিকারী, সিরাতিম মুস্তাকিমের পথযাত্রী। এঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকেও মনোনীত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, হযরত রাসুল (সা.) ফরমান- 'নিশ্চয় মহান মহিমায় আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি দ্বীন (ধর্ম)-কে সজীব করে তোলেন।' (মিশকাত শরিফ, পৃষ্ঠা : ৩৬)। অন্য হাদিসে আছে, 'যে ব্যক্তি, তার জামানার ইমামকে (যুগশ্রেষ্ঠ ওলি-আল্লাহ) চিনতে পারলো না এবং এ অবস্থায় যদি মৃত্যু ঘটে, তবে তার মৃত্যু অন্ধকারে নিমজ্জিত ও নিপতিত হবে' (মেজামুয়ায়ে ফতুয়া)। মোরাকাবা করার প্রারম্ভে দরকার খাঁটি মোর্শেদের সোহবত বা পরামর্শ নেওয়া। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর রাসুলকে মান্য করো এবং সাদেকিনদের (ওলি-আল্লাহর সোহবত) সঙ্গ লাভ করো।' মারেফত বা এলমে তাসাউফ শিক্ষা অর্জনের জন্য মোর্শেদের প্রয়োজন রয়েছে। মারেফত ছাড়া বাতেনি রাস্তার অনুসন্ধানী হওয়া যায় না। যে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানী হলে যেমন বিশাল অর্জন সম্ভব হয় ঠিক তেমনি আল্লাহর পথের অনুসন্ধানী হলে আল্লাহওয়ালা বা মুমিন হওয়া যায়। মানুষের দিল হচ্ছে মহাভেদ ও বাতেনের দরিয়া। একজন ডুবুরি যেমন গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে তলদেশ থেকে মণি-মাণিক্য তুলে আনেন, তেমনি মানুষও তার দিলের মধ্যে ডুবে জগতের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন আল্লাহ পাককে মোরাকাবার মাধ্যমে আবিষ্কার করতে পারেন। আল্লাহকে খুঁজে বের করার জন্য অনেকগুলো সাধনা রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম সাধনা হচ্ছে মোরাকাবা। সুতরাং মোরাকাবার মাধ্যমেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝের ভেদ ও রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব।

লেখক : সভাপতি, সুফিশীলন ফাউন্ডেশন।

আত্মার গহিনে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি (রহ.)

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি (১৯৩৫ - ২০১৫) হযরত মুহম্মদ (সা.) এর বংশধর এবং সাজিলিয়া সুফি তরিকার একজন মুর্শিদ ছিলেন। জেরুসালেমস্থ সুফি কাউন্সিলের তিনি প্রধান এবং দীর্ঘদিন মসজিদ আল-আকসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার রওজা মোবারক পবিত্রভুমি ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত। এই লেখাটি তার 'মান আরাফ নাফসাহু আরাফ রাব্বাহু' বইটি থেকে অনূদিত। অনুবাদ করেছেন সাদিক মোহাম্মদ আলম।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

নশ্বর পৃথিবীর সমালোচনা, এর উপভোগ্য এবং পরমবাস্তবতা

মৃত্যুর আগে যা যা ঘটে, ভালো ও মন্দ উভয়ই, তা নিয়েই এই নশ্বর পৃথিবী বা দুনিয়া। আল্লাহর রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুনিয়ার সমালোচনার ক্ষেত্রে এর ভালাই নিয়ে একটি ব্যতিক্রমী কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই দুনিয়া অভিশপ্ত এবং ভেতরে সবকিছুই অভিশপ্ত শুধু তা ব্যতীত যা আল্লাহর জন্য; সকল ক্ষমতা ও মহিমা কেবলমাত্র তাঁর।' তিনি আরো বলেছেন, 'এই নশ্বর জগৎ ও জগতের মধ্যে প্রত্যেক জিনিস অভিশপ্ত কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণ এবং সেই স্মরণ সম্পর্কিত কোনো কিছু ব্যতীত।'

ভালোর প্রতি নির্দেশ, প্রাকৃতিক ও স্বভাবগতভাবে যা মন্দ তা সম্পর্কে নিষেধ এবং আল্লাহর উদ্দেশে পরিচালিত কাজ/ জিনিস ব্যতীত এই পৃথিবীর সবকিছুই অভিশপ্ত। রাসলু (সা.) দুনিয়ার যে বিষয়টিকে অভিশপ্ত হওয়ার বাইরে রেখেছেন সেটিও এই দুনিয়ারই ভেতরে হয় এরূপ বিষয় কিন্তু সেটিকে ব্যতিক্রম করার কারণ হলো এই– মৃত্যুর পরে বান্দার সঙ্গী হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের দুনিয়ার তিনটি বিষয়কে আমার কাছে ভালোবাসার বিষয় করা হয়েছে: নারী, সুগন্ধি এবং সালাতে অবস্থানকালে চক্ষুর শীতলতা।' উল্লেখ্য, তিনি সালাতকে এই নিম্ন জগতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কেননা এর ভেতরের যে গতিবিধি তা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। একই সঙ্গে বোধগম্য যে প্রত্যেক উপভোগ্য বিষয়ের মৃত্যু-পরবর্তী ফল রয়েছে; এবং সালাত বা নামাজ সেই অর্থে অভিশপ্ত দুনিয়া থেকে নয়, বরং এটার সেই ফল রয়েছে যা মহান আল্লাহপাককে সন্তুষ্ট ও খুশি করে। দুনিয়ার অভিশাপ সেই বিষয়গুলো ধারণ করে যেগুলোকে খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে মানুষ পেতে যায় এবং যার উদ্দেশ্য থাকে খুব সীমিত এবং যা মৃত্যুর পরে কোনো ভালো ফল প্রদান করে না। তবে এ দুই পথের মাঝামাঝিও একটি পথ রয়েছে। যেসব সৌভাগ্য আখিরাতের জন্য ভালো করার তওফিক দান করে তা প্রথম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কেননা তার মাধ্যমে আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জনে কাজে লাগে। সুতরাং যখন কেউ খাদ্য গ্রহণের সময়ে অল্প খাদ্য গ্রহণ করে (তার পাকস্থলী অর্ধেক খালি রাখে) সে একই সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ যেমন উপভোগ করলো, তেমনি একই সঙ্গে তার রিজিকদাতাকেও সন্তুষ্ট করলো। অন্যভাষায় সে একই সঙ্গে এই দুনিয়া এবং পরবর্তী দুনিয়া উভয়ের সৌভাগ্যই প্রাপ্ত হলো। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সুন্দর পোশাক পরো, খাবার ও পানীয় গ্রহণ করো এবং কেবলমাত্র অর্ধেক পেট খাও কেননা এটিই হলো সকল নবীর বৈশিষ্ট্য।'

যা কিছুই মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ব্যস্ত বা বিরত রাখে এবং যা কিছুই মানুষকে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া থেকে ফারাক রাখে সেটাই দুনিয়ার অংশ। আল্লাহর স্মরণ ও তার দিকে ফেরা অনেক সময় মনে হয় এই নশ্বর দুনিয়ার অংশ কেননা এটা আসলে এই দুনিয়াতেই করণীয় বিষয় কিন্তু বাস্তবে তা আখিরাতেরই কাজ যা দুনিয়ায় করা হয়ে থাকে। আল্লাহ সুবহ-ানাহু ওয়াতাআলা দুনিয়ার প্রকৃত বাস্তবতা আমাদের কাছে প্রকাশ করছেন এই আয়াতের মাধ্যমে, 'এই দুনিয়ার জীবন কেবলমাত্র খেলাধুলা, তামাশা এবং চাকচিক্য ও নিজেদের মধ্যে দম্ভ সংবলিত এবং বস্তু জমানো এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে প্রতিযোগিতা' (কুরআন ৫৭:২০)। এ সকল মন্দ কাজই আল্লাহর কুরআনে উল্লিখিত সাতটি মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলছেন, 'মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও কাম্য করা হয়েছে নারীর প্রতি কামনা, সন্তান, জমিয়ে স্তূপ করা স্বর্ণ ও রৌপ্য, সুদৃশ্য ঘোড়া, গবাদি পশু ও চাষের জমি। মন্দ ও অসুন্দর যাবতীয় কাজ এই সাতটি বিষয়ের প্রতি কামনা থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু এই বিষয়গুলো নিজে থেকে মন্দ বা বর্জনীয় নয় কেননা তাদের সদ্ব্যবহার একজনকে আখিরাতের মঙ্গলে পৌঁছে দিতে পারে (যেমন: সম্পদ অর্জনের পর তার মাধ্যমে গরিবদের উপকার সাধনে)।

আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কেবলমাত্র দুজন ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো অবস্থাই অনুকরণীয় নয়: একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং তিনি সকাল ও সন্ধ্যায় তা থেকে ব্যয় করে আল্লাহর রাহে এবং আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর কিতাবের (জ্ঞান) দিয়েছেন এবং তিনি সকাল ও সন্ধ্যা এটি প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত।' আল্লাহর রাসুল সেই দুনিয়াকে অভিশাপ দিয়েছেন যা আল্লাহ ও তাঁর বাণী থেকে দূরে এবং যা কোনো সুউদ্দেশ্যবিহীন এবং সেটাকেই যা বান্দার অন্তরকে ব্যস্ত রেখে গাফেল করে দেয় এবং আল্লাহকে মান্য করতে বিরত রাখে।

এই দুনিয়ার কামনা পরিপূরণ বিশ্বাসী বান্দাকে শান্তি দেয় না। এটা কীভাবে শান্তি দেবে যখন দুনিয়ার বাস্তবতা তার কাছে অনেকটা কারাগার ও হাজতবাসের মতো। রাসুল (সা.) বলেছেন: 'যে তার নশ্বর দুনিয়াকে ভালোবেসেছে সে তার চিরস্থায়ী জগৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো এবং যে তার চিরস্থায়ী জগৎকে ভালোবেসেছে সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংস হয়ে যাবে এটার পরিবর্তে সেটাকে বেছে নাও যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। তিনি আরো বলেছেন, 'সকল পাপের মূল কারণ হলো নশ্বর দুনিয়ার মোহ।' 'এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে চিরস্থায়ী জগতের বিশ্বাসী বান্দা ধোঁকাবাজ ও বিপজ্জনক ঘরের মায়ার পেছনে ছুটছে।'

(চলবে)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।